# পদার্থবিদ্যা ও সাধারণ পাঠক

**অর্ণব রায়চৌধুরী**

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেংগলুরু, কর্ণাটক।*

পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে উচ্চশিক্ষিত মানুষদের মধ্যেও অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে। বহু ক্ষেত্রে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের লেখকরাও অনেক ভ্রান্ত ধারণার জন্য দায়ী। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে একটা নৈর্ব্যক্তিক ধারণা হোক—এটা যদি আমরা চাই, তবে গবেষণারত বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষকে তাঁদের গবেষণার বিষয় সহজ করে বোঝাবার জন্য। ইংরেজি ছাড়াও আমাদের মাতৃভাষা বাংলাতেও এই কাজটা করা অত্যন্ত জরুরি।

অনেক বছর আগে — যখন আমি সবেমাত্র পদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করেছি — আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই আমাকে একদিন বললেন, ''আমরা ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়ে শিখেছিলাম, পদার্থবিদ্যার ছ'টা শাখা — General Physics, Heat, Sound, Light, Electricity, Magnetism. তুমি এর কোন শাখায় গবেষণা কর?'' প্রশ্নটা সঙ্গত সেটা অস্বীকার করতে পারি না। তবে এই প্রশ্নটার সম্মুখীন হলে পদার্থবিদ্যার অধিকাংশ গবেষকই যথোপযুক্ত উত্তর দিতে পারবেন না।

স্কুল-কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক আর পদার্থবিদ্যা গবেষণার সীমান্ত — এই দু'য়ের মধ্যে আজ একটা বিরাট ব্যবধান হয়ে গেছে। যতদূর জানি, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ক্ষেত্রে এই ব্যবধানটা এতটা প্রকট নয়। এর একটা কারণ অবশ্যই এই যে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বয়সের কৌলীন্যে পদার্থবিদ্যা অনায়াসেই বড়দার সম্মান দাবি করতে পারে, এবং গবেষণার সীমান্তে পৌঁছাবার আগে পদার্থবিদ্যার যত প্রাথমিক জিনিষ শিখতে হয় তার পরিমাণ বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চাইতে অনেক বেশি। গ্যালিলিওকে পদার্থবিদ্যার আদিপুরুষ ধরে নিলে পদার্থবিদ্যার বয়স চার শতাব্দী ছাড়িয়েছে। যদি ল্যাভয়সিয়েরকে রসায়নের জনক মেনে নিই, তবে রসায়নের বয়স তার অর্ধেক। আর জীববিদ্যা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে আরও হালে — ডারউইন-মেন্ডেলের যুগে।

পদার্থবিদ্যার শিক্ষাদান প্রণালী পাল্টে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব কি না তাই নিয়ে অনেক বড় বড় পণ্ডিত মাথা ঘামিয়েছেন। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে আমেরিকার প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। বার্কলিতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তার ফল Berkeley Physics Course, এবং ক্যালটেকে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তার ফল Feynman Lectures. এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বাঘা বাঘা অধ্যাপকেরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন সেটা হল, পদার্থবিদ্যার ধ্রুপদী অংশটা সম্যক রূপে আয়ত্ত না করে গবেষণার সীমান্তে পৌঁছানো যায় না।

খুব অল্প মানুষই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ স্তরে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। বাকি সবার কাছেই কি তবে পদার্থবিদ্যার সীমান্তটা একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য থেকে যাবে? এই সমস্যার একটাই সমাধান, পদার্থবিদ্যার সীমান্তের বিভিন্ন বিষয়কে Popular Science বা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া, যাতে তাঁরা খানিকটা অন্তত ধারণা করতে পারেন, পদার্থবিদ্যার সীমান্তে আজকের দিনে কী ঘটছে। এখন প্রশ্ন হল, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখার কাজটা কারা করবেন? নিম্নলিখিত দু'ধরনের মানুষ এই কাজটা করতে পারেন।

(1) পেশাদার বিজ্ঞান-সাংবাদিক বা বিজ্ঞান-লেখক। পৃথিবীর অনেক দেশেই এই লেখকেরা নিয়মিত খবরের কাগজে ও পত্রিকায় বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখে সাধারণ পাঠককে বিজ্ঞানের সীমান্ত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করেন। আমাদের দেশে এই পেশাটার সবেমাত্র সূত্রপাত হচ্ছে। আমাদের দেশের অনেক সংবাদপত্রেই যিনি রাজনৈতিক কেচ্ছা বা ফ্যাশন নিয়ে লেখেন তাঁকেই বিজ্ঞান নিয়ে কলম ধরতে দেখা যায়। তার ফল কি হয় সে-সম্পর্কে মন্তব্য না করাই সমীচীন।

(2) পেশাদার বিজ্ঞানী। যাঁরা বিজ্ঞানের গবেষণা করেন তাঁদের অনেকেরই বিজ্ঞানকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা থাকে না। যে বিজ্ঞানীরা এই দুর্লভ ক্ষমতাটা রাখেন তাঁদের লেখনী থেকে আমরা বিজ্ঞানের

সীমান্তের একটা যথাযথ ছবি পাব এমনটা আশা করতে পারি।

সাধারণ পাঠকের কাছে বিজ্ঞানকে ব্যাখা করার কাজটা পেশাদার বিজ্ঞান-লেখকদের ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞানের গবেষকরা যদি শুধু নিজেদের গবেষণা নিয়েই থাকেন তবে কেমন হয়? আমার নিজের দৃঢ় ধারণা, পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অন্তত বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার বিষয় নিজেরা ব্যাখ্যা করতে এগিয়ে না আসার ফলটা বহুক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর হয়েছে।

ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদের অভ্যুত্থান পৃথিবীর সর্বত্রই বিবেকবান মানুষদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। গত কয়েক দশক ধরে আমরা পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও একটা মৌলবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেখছি। কয়েকজন লেখক সাধারণ পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন, আধুনিক পদার্থবিদ্যায় যে-সব বিষয় নিয়ে গবেষণা হচ্ছে তার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই যথার্থরূপে মৌল (Fundamental)। কোন কোনও বিজ্ঞান লেখকের লেখায় এমনও উদ্ধত মন্তব্য দেখতে পাই যে, তাঁদের দেওয়া পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাখ্যা পড়ে পাঠকেরা 'ঈশ্বরের মন' (the mind of God) বুঝতে পারবেন। বিজ্ঞানে অনুরাগী অনেক সাধারণ পাঠকেরও ধারণা জন্মাছে, বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) এবং কণা পদার্থবিদ্যার (Particle physics) কিছু অংশই শুধুমাত্র সত্যিকারের পদার্থবিদ্যা। পদার্থবিদ্যার এই শাখাগুলোতে গত কয়েক দশকে যে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ অনেক আবিষ্কার হয়েছে তা তর্কাতীত। কিন্তু রামধনুর সাতটা রঙের মধ্যে শুধু একটা রঙই যদি কারও চোখে পড়ে তবে তাঁকে বর্ণান্ধ ছাড়া কি বলব?

গ্যালিলিওর হাতে যখন পদার্থবিদ্যার প্রথম সূত্রপাত হচ্ছিল, তখন সেকালের অনেক বড় পণ্ডিত ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখেননি। তাঁরা মনে করেছিলেন, গ্যালিলিও কতগুলো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেন এবং কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, ঈশ্বরের স্বরূপ কেমন, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী, ঈশ্বর কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন — এগুলোই ছিল সেকালের অনেক পণ্ডিতের কাছে বড় প্রশ্ন। গ্যালিলিও মানুষকে বোঝালেন, প্রশ্ন যতই মহৎ হোক, যে প্রশ্নের উত্তর আমাদের আয়ত্তের বাইরে সেই প্রশ্ন আলোচনা করাটা সময় নষ্ট মাত্র। হেলানো সমতলের ওপর দিয়ে বল কীভাবে গড়িয়ে নামে, পেণ্ডুলাম কেন দোলে — এইসব আপাত-তুচ্ছ প্রশ্নের মীমাংসা করেই গ্যালিলিও পদার্থবিদ্যার অগ্রগতির একটা ধারা নির্দেশ করে দিলেন। ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর বার করে পদার্থবিদ্যার সেই যে হাঁটি হাঁটি পা পা যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই যাত্রাপথে চলেই পদার্থবিদ্যা আজ আমাদের অনেক বড় প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্তমানে কীভাবে তার বিবর্তন ঘটছে তা আজ পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। এটা অবশ্যই পদার্থবিদ্যার বিরাট গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন — ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা — এটাই যে পদার্থবিদ্যার মূল ঐতিহ্য সেটা ভুলে গেলে আমরা পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।

পদার্থবিদ্যার গবেষণার সীমান্তকে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়াসে মৌলবাদের এই মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠাটা অনেক পদার্থবিজ্ঞানীকেই চিন্তান্বিত করে তুলেছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিশ্বতত্ত্ব ও কণা পদার্থবিদ্যা নিয়ে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখা হয়েছে, যেগুলোর আমি বিশেষ ভক্ত পাঠক—যেমন Steven Weinberg-এর 'First Three Minutes' কিংবা Brian Greene এর 'The Fabric of the Cosmos'। আমার আপত্তি সেই লেখকদের সম্পর্কে, যাঁরা পদার্থবিদ্যার একটা একপেশে ভ্রান্ত রূপ সাধারণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছেন।

পদার্থবিদ্যা নিয়ে যে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন তাঁদের একটা প্রধান অংশই গ্যালিলিও-নিউটনের ঐতিহ্য ধরে বিভিন্ন ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর খুঁজে যাচ্ছেন। এইসব ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর থেকেই আমাদের কাছে ক্রমশ প্রকৃতির বহু রহস্যের মূল সূত্র উদ্‌ঘাটিত হয়ে উঠছে। পদার্থবিদ্যার এই ধারাটাকে সম্যক অনুধাবন করতে হলে পদার্থবিদ্যায় খানিকটা দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। পদার্থবিদ্যার উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়াই যাঁরা পেশাদার বিজ্ঞান-লেখক হয়েছেন তাঁদের পক্ষে পদার্থ বিদ্যার এই ধারাটাকে ঠিক মতো বোঝা অনেক সময়েই সম্ভব হয়ে ওঠে না। পদার্থবিদ্যার যে গবেষকদের খানিকটা লেখার হাত আছে তাঁদের এগিয়ে এসে সাধারণ পাঠকের কাছে পদার্থবিদ্যার বহুমাত্রিক রূপটাকে তুলে ধরার প্রয়োজন এখানটাতেই। শুধুমাত্র তাহলেই পদার্থবিদ্যার প্রকৃত রূপটা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে খানিকটা অন্তত ধারণা জন্মাতে পারে।

বিগত কয়েক দশক ধরে পদার্থবিদ্যার প্রাঙ্গণে আমি প্রকৃতির একটা সামান্য রহস্যকে বোঝার কাজে নিয়োজিত থেকেছি। অনেকেই জানেন, সৌরকলঙ্কের একটা এগারো বছরের চক্র আছে। প্রতি এগারো বছর বাদে বাদে সূর্যের দেহ বহু সৌরকলঙ্কে চিহ্নিত হয়ে ওঠে। আজ থেকে এক শতাব্দীরও আগে ১৯০৮ সালে যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ এলারি হেল সৌরকলঙ্কের মধ্যে অতি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের অস্তিত্ব অবিষ্কার করলেন, তখন বোঝা গেল, সৌরকলঙ্কের এই চক্র প্রকৃতপক্ষে সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের চক্র। পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে এই চক্রের উৎপত্তির কারণ মীমাংসা করার প্রয়াসে আমি নিজের সাধ্য-মতো কিছু অবদান করেছি। সৌরকলঙ্কের এই চক্রটাকে বোঝা গেলে তার থেকে আমরা 'ঈশ্বরের মন' বুঝতে পারব এমন দাবি বোধহয় কেউ করবেন না। তবুও সৌরকলঙ্কের চক্র নিয়ে এই গবেষণা করে প্রভূত আনন্দ পেয়েছি এবং এই আনন্দের অংশ সাধারণ পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় কিনা সেই চিন্তাটাও বার বার মাথায় এসেছে।

সৌরকলঙ্কের চক্র নিয়ে সাধারণ পাঠকের জন্য কেউ কিছু লিখছেন না দেখে একদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, সৌরকলঙ্কের চক্র নিয়ে একটা আস্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই আমিই লিখে ফেলব। আগে যেহেতু কখনো ইংরেজিতে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের ছোট প্রবন্ধও লিখি নি, সেহেতু আশঙ্কা ছিল, কোনও প্রকাশক এমন অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের বই ছাপবেন কিনা। আমার অশেষ সৌভাগ্য, Oxford University Press-এর মতো নামী আন্তর্জাতিক সংস্থা আমার বই প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন। এই হঠকারিতার জন্য পরে তাঁরা অনুতাপ করবেন কিনা বলতে পারি না। আপাতত এই জানুয়ারি মাসে 'Nature's Third Cycle : A Story of Sunspots' নামে আমার বইটা প্রকাশিত হবার কথা রয়েছে। বইটা প্রকশিত হলে গুণিজনেরা বিচার করবেন, সৌরকলঙ্কের চক্র নিয়ে গবেষণা করে আমি যে আনন্দ পেয়েছি সেই আনন্দটাকে পাঠকদের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারলাম কিনা।

বইটা লেখার যখন পরিকল্পনা করছিলাম, তখন একটা প্রশ্ন বার বার মনে আসছিল — কোন ভাষায় বইটা লিখব, বাংলায় না ইংরেজিতে। ইংরেজি এখন

বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বীহীন আন্তর্জাতিক ভাষা। তাই আমাদের গবেষণার ফলাফল ইংরেজিতেই প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু জনপ্রিয় বিজ্ঞান লিখতে হলে আমাদের প্রত্যেকের মাতৃভাষাতেই লেখা উচিত, এইরকম একটা অভিমত আমি বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অনেক সময়ে ব্যক্ত করেছি। মাঝে-মাঝে বাংলায় এক-আধটা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা করলেও জেদ করেই কখনও ইংরেজিতে সেরকম কোনও প্রবন্ধ লিখিনি। যেহেতু সৌরকলঙ্কের চক্র নিয়ে ইংরেজিতেও কোনও উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই লেখা হয়নি, অনেকে আমাকে বোঝালেন, আন্তর্জাতিক পাঠকদের কথা ভেবে আমার বইটা ইংরেজিতেই লেখা উচিত। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারও বুঝতে পারছিলাম। ইংরেজি যত সহজে লিখতে পারি, বহু বছরের অনভ্যাসে এখন আর তত সহজে বাংলা লিখতে পারি না। এটা আমার গভীর দুঃখ ও লজ্জার ব্যাপার হলেও এই সত্যটাকে অস্বীকার করতে পারা যায় না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য যখন রূপকথার রাজকন্যার মতো ঘুম ভেঙে জেগে উঠছিল, তখন একটা সময়ে মনে হয়েছিল, বাংলায় বিজ্ঞান লেখারও একটা ঐতিহ্য হয়তো গড়ে উঠবে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করতে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করলেন, এইরকম একটা পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞানের প্রবন্ধ প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যের ওপর ভরসা না করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং কলম ধরলেন বিজ্ঞান নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে। রচনা-নৈপুণ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোকে বোধহয় আজও কোনও বাঙালি লেখক অতিক্রম করতে পারেননি। এই বাংলার মাটিতে যাঁরা পদার্থবিদ্যা গবেষণার পথিকৃৎ সেই জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বোসও দুর্লভ রচনাশক্তির অধিকারী ছিলেন। কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যে বাংলায় তাঁরা অতি অল্প পরিমাণে যা লিখে গেছেন, তা পড়লে আমাদের ক্ষোভ হয়, বাংলায় কেন তাঁরা আরও লিখে যাননি! কিন্তু আজকের দিনে আমার বিশিষ্ট বন্ধু পলাশ বরন পাল ও বিমান নাথের মতো দু-তিনজন ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানী তথা লেখককে বাদ দিলে বাংলায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখার এই ধারাটা কোথায় যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগে পলাশ বরন পাল একটা প্রশংসনীয় উদ্যম নেয় — যে বাঙালিরা পদার্থবিদ্যার গবেষণায় খানিকটা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের দিয়ে তাঁদের গবেষণার বিষয়ে বই লিখিয়ে একটা সিরিজ বের করার। তখন অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরী জীবিত। অমলবাবু ও অশোক সেনের মতো দিকপালদের থেকে শুরু করে এই অধম পর্যন্ত অনেককেই পলাশ বই লিখতে আধ-রাজি করে ফেলেছিল। অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার, আমরা অধিকাংশই পলাশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারিনি। এই সিরিজটা তাই পলাশের মানসী কল্পনাই থেকে যায়।

গবেষণারত বাঙালি বিজ্ঞানীরা কেন বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান লিখতে উৎসাহী নন সেই প্রশ্নের বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে শুধুমাত্র একটা ঘটনার উল্লেখ করি। তার থেকে পাঠকরা হয়তো প্রশ্নটার আংশিক উত্তর পাবেন। পলাশের প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক বই 'কী দিয়ে সমস্তকিছু গড়া' তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। অনেক কাল বাদে সেই বছর কলকাতা বইমেলায় যাবার সুযোগ ঘটেছিল। রাজ্য পুস্তক পর্ষদের দোকানে ঢুকে দেখলাম, তাঁদের প্রকাশিত যে-সব বই অনেকে কিনবেন বলে তাঁরা আশা করছেন সেই রকম কিছু বই সামনের টেবিলের ওপরে সাজিয়ে রাখা। সেখান থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর একটা সংকলন তুলে কিনবার জন্য কাউন্টারে দিচ্ছি, হঠাৎ কাউন্টারের পেছনে ক্রেতাদের নাগালের বাইরে রাখা পলাশের বইটা চোখে পড়ল। কাউন্টারের ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম বইটা দেখাতে। যে লোকটা বৈষ্ণব পদাবলীর বই কিনছে সে যে ঐ বইটাও দেখতে চাইছে এটা ভদ্রলোকের মনঃপূত হল না। তিনি ব্যাজার মুখ করে বললেন, ''ওটা তো Physics-এর বই! খুব শক্ত বই— ও আপনি বুঝবেন না।'' সবিনয়ে বললাম, ''আমিও একটু আধটু Physics জানি। দয়া করে বইটা একবার দেখান না।'' অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে বইটা এনে দিলেন।

বইয়ের জগতের মানুষদেরই যদি এই মনোভাব হয় তবে বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বইয়ের ভবিষ্যৎ কি? মনে হয়, বিজ্ঞানের বইয়ের ব্যাপারে আমরা যেন একটা অবিচ্ছেদ্য চক্রব্যূহে পড়ে গেছি। বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই নিয়ে লোকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না বলে বিজ্ঞানীরা (যাঁদের লেখার হাত আছে) বাংলায় লিখতে উৎসাহ পাচ্ছেন না। আর উপযুক্ত যোগ্যজনেরা উৎকৃষ্ট বই লিখছেন না বলে সাধারণ পাঠকেরা বাংলায় জনপ্রিয় বিজ্ঞানের ব্যাপারে আগ্রহ নিচ্ছেন না। এই চক্রব্যূহ ছিন্ন করার অভিমন্যুকে আমরা কবে পাব?

---

অর্ণব রায়চৌধুরী বেংগলুরুর Indian Institute of Science এ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে BSc এবং আই আই টি কানপুর থেকে MSc করার পর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে তিনি ১৯৮৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। তাঁর গবেষণার বিষয় তাত্ত্বিক জ্যোতির্বিজ্ঞান—বিশেষত সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্র ও সৌর-কলঙ্কের উৎপত্তি। তিনি Indian Academy of Sciences এবং Indian National Science Academy-র নির্বাচিত ফেলো। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত তাঁর দুটি বই "The Physics of Fluids and Plasmas" এবং "Astrophysics for Physicists" পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।